নয়া শিক্ষা নীতি বনাম চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ

মল্লারিকা সিংহ রায়

বহুকাল আগে, এই অতিমারী যুগের পূর্বে — অর্থাৎ কিনা এইবছরের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ — আমার দিন প্রায়ই শুরু হত অনেকগুলি শিশুকণ্ঠের আওয়াজে। বাড়ির পাশে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে সকালের প্রার্থনায় কচি গলার আওয়াজ একসঙ্গে উঠত নামত। সকাল এগারোটার পর আমি ওই ইশকুলের সামনের বড়োরাস্তা ধরে যাতায়াত এড়িয়ে চলতাম। ইশকুল ছুটির সময়ে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের আনাগোনায় ব্যস্ত রাস্তাটা জ্যাম হয়ে যেত মাঝে মাঝেই। এখন সেখানে পিচ ঢালা রাস্তাটা ক্লান্ত ময়াল সাপের মতো পড়ে থাকে, ইশকুল-বাড়িটাও বিজন। পৃথিবীতে বোধ হয় নির্জন, নিস্তব্ধ ইশকুল-বাড়ির চেয়ে মনখারাপ করা জায়গা খুব কমই আছে। বাগানের ফুল তোলার কেউ নেই, প্রজাপতিদের ইতিউতি ওড়ার সময় কোনো ছোটো ছোটো পা তাদের পিছনে দৌড়োয় না। এ যেন ঘুমিয়ে পড়া রূপকথার রাজ্য। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই তার ক্যাম্পাসও গত পাঁচ মাস ধরে জনশূন্য। লাইব্রেরির সামনে ছেলেমেয়েদের জটলা নেই, বিকেলের ক্যান্টিনের কলকাকলি আর পাকোড়ার মনমাতানো সুবাস নেই, সন্ধ্যায় ধাবাগুলিতে হাঁক পেড়ে চায়ের ফরমায়েশ নেই, ধাবার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিতর্কে তেতে ওঠা জনসমাবেশ নেই। আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্যে যেভাবে বিভিন্ন জায়গাগুলি তাদের শব্দ-গন্ধ নিয়ে চৈতন্য জুড়ে থাকে, সবই কেমন ওলট পালট হয়ে গিয়েছে।

তবে এমনটা যে হবে অতিমারীর শুরুর দিনগুলিতেই তা বোঝা গিয়েছিল। ক্লাসঘর শূন্য করে ছেলেমেয়ের দল যে বাড়িতে বন্দি হয়ে পড়বেই, এই ঘটনাটায় আকস্মিকতা ছিল, কিন্তু তার কারণ বুঝে তাকে মানিয়ে নেবার মানসিকতায় আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ঘাটতি

পড়েনি। এই বিষম সময়ে একটু ভাবনা চিন্তা করে, শারীরিক দূরত্বের অসুবিধেগুলি বিবেচনা করে সরকারি শিক্ষা বিভাগের নানাস্তরের কর্তৃপক্ষ একটা সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু আমাদের দেশের সরকার বোধহয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আদতে বড়োই অসহায়। আমরা, যারা তুলনায় ভাগ্যবান, টেলিভিশনের পর্দায় দেখ লাম লক্ষ লক্ষ নিরুপায় মানুষ হাজার হাজার কিলোমিটার পথ হেঁটে বাড়ি ফিরছেন, বাড়িতে কোনো সুরক্ষা বা নিরাপত্তা নেই জেনেও তাঁদের আর কোথাও ঠাঁই হল না। শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে সরকারের মাথা ঘামানোর সময় নেই এই বিপর্যয়ের সামনে, এই ভেবে আমরা, অর্থাৎ শিক্ষকের দল, চুপ করে রইলাম। আগে মানুষ প্রাণে বাঁচুন, তারপর না হয় শারীরিক দূরত্ব মেনে শিক্ষাদানের কর্ম পদ্ধতি আলোচনা করা যাবে!

কিন্তু তা হল কই? আমাদের 'স্মার্ট' হয়ে ওঠার অদম্য বাসনার কাছে হার মানল সামাজিক ন্যায়ের বুনিয়াদি কাঠামো। বিপর্যয় হোক, তবু আন্তর্জালের মাধ্যমে চালাতে হবে শিক্ষাদান এবং অধ্যয়ন। শিক্ষকদের তো বসিয়ে মাইনে দেওয়া যায় না! এমনিতেই সকলে ভাবেন পড়িয়ে দেওয়াটা আর এমন কী কাজ, তার ওপর যদি বেসরকারি কর্তৃপক্ষ মাথার ওপর থাকেন তাহলে তো পড়িয়ে দেওয়ার কাজটা কত ন্যূনতম মজুরি দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় সেটাই সকলের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ায়। কী পড়ানো হচ্ছে, কীভাবে পড়ানো হচ্ছে, ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রীরাই সব পাঠ্যগুলি সমানভাবে বুঝতে পারছে কিনা, সকলের হাতের কাছেই পাঠ্য বুঝে নেবার নানা উপকরণ রয়েছে কিনা এগুলি নিয়ে খুব কম, হাতেগোনা মানুষ ভাবেন। সরকার, কর্তৃপক্ষ থেকে অভিভাবক (এবং কে জানে হয়তো অনেক ছাত্রছাত্রীরাও) কেবলই সিলেবাস শেষ করে একটি বার্ষিক পরীক্ষার ফলের উপর শিক্ষার সমস্ত ভার দিয়ে রাখেন। আমাদের সময়টা বাজারীকরণের কারণ 'বাজার' আমাদের জীবনের নিয়ন্তা। আমরাই সেটা হতে দিয়েছি অবশ্য। কাজেই তা নিয়ে বেশি দুঃখ না করে মনে রাখা ভালো বাজারের মধ্যে বস্তু বিকোয় তার ভার আর গুণের কারণে। আমাদের দেশে শিক্ষাটাকে ভারের দামে বিকোতে আর কিনতে শিখেছি, গুণের দামে নয়। অতএব অতিমারীর ক্রান্তিকালে যখন শিক্ষার উপর প্রথম কোপটা পড়লো নবম এবং দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি ছাঁটাইএর মাধ্যমে, আমার তো ব্যক্তিগতভাবে প্রথম দিকে খুব একটা খারাপ লাগেনি। নাহয় এবছর ছেলেমেয়েরা ঠাসা পাঠ্যসূচি দু-চারটে জিনিস কম পড়ল — কম মুখস্থ করবে তাহলে; হয়তো হাতে একটু সময় থাকার দরুন শুধু মুখস্থর বদলে পাঠ্যসূচি কয়েকটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে। আখেরে লাভ তাতে সকলের। যা যা বাদ গেল, চিন্তা করার সুযোগ পেলে হয়ত নিজেরাই পড়ে নেবে। কিন্তু ছাঁটাই হওয়া অংশগুলো দেখে ভ্রম ছুটে গেল।

আমাদের 'স্মার্ট' নীতি নিয়ন্তাদের বিধান অনুযায়ী যে যে বিষয় গুলি পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়লো, তার অধিকাংশই সামাজিক ন্যায় সংক্রান্ত। যথা, দশম শ্রেণির 'সোশ্যাল সায়েন্স' বিভাগের পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে বাদ গেল 'ডেমোক্রাসি এন্ড ডাইভারসিটি', 'জেন্ডার, রিলিজিয়ন এন্ড কাস্ট', 'পপুলার স্ট্রাগলস অ্যান্ড মুভমেন্টস' আর 'চ্যালেঞ্জেস টু ডেমোক্র্যাসি'। বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে কর্তৃপক্ষ ঠিক কোনো কোনো জ্ঞান অর্জনের রাস্তাটা ছেলেমেয়েদের কাছে শুরুতেই বন্ধ করে দিতে চান। এইগুলো জেনে ফেললে যদি পরে প্রশ্ন করে! গণতন্ত্র বিষয়টা কী, তার তাত্ত্বিক ভিত্তির একেবারে প্রাথমিক পাঠটুকুও বাদ চলে গেলে আন্তর্জালের পল্লীসমাজ থেকে আহরিত অনেকগুলো ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যে ভারতের এক বৃহত্তর যুবসমাজের কী দশা হবে তার কথা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাউকে তেমন মাথা ঘামাতে দেখলাম না। আন্তর্জালের পল্লীসমাজ যে কী ভয়ানক এক চিৎকৃত আবিলতার প্রকাশ তা নিয়ে আর নতুন করে কিছু বলার নেই। আপাতত এটুকু মনে রাখা জরুরি যে গণতন্ত্র, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি, ভারতে তার প্রয়োগ এবং গণতন্ত্রে গণআন্দোলনের ভূমিকা এই কটি বিষয় পাঠ্য তালিকা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে 'স্মার্ট' নীতিনির্ধারকের দল আর একবার প্রমাণ করলেন যে তাঁরা শিক্ষার গুণের দাম টুকু দিতে নারাজ।

শিক্ষার হদ্দমুদ্দ

এই পরিপ্রেক্ষিতেই এল নয়া শিক্ষা নীতি। এবং শিক্ষার নীতি, পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে খটকা বাড়ল বই কমল না। নয়া শিক্ষা নীতির ভূমিকায় অনেক ভালো ভালো কথা আছে। পাঠ্যসূচি কী কী থাকা উচিত এবং এই শিক্ষা নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষকদেরও কোনো কোনো ইতিবাচক, বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠতে হবে তার এক লম্বা তালিকা আছে। তাতে কম্পিউটার কোডিং থেকে সাংবিধানিক মূল্যবোধ সবই আছে। এই বিচিত্র তালিকাটির

ফলে, সরকার শিক্ষার প্রতি সত্যি কতটা গুরুত্ব দেন, তাই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ তৈরি হয়। নয়া শিক্ষা নীতির ১৫ পাতায় বলা হচ্ছে যে এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সকল ছাত্রছাত্রী যেন এই নীতিতে শিক্ষা পেয়ে একাধারে 'good, successful, innovative, adaptable, and productive human beings' হয়ে ওঠেন। সরকার কী ধরনের ভবিষ্যতের নাগরিক চান, তার তালিকাটি কিন্তু এর মধ্যেই ধরা আছে। এই তালিকাতেই পরে যুক্ত হচ্ছে সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং মৌলিক কর্তব্য। যে বিষয়টা তালিকার কোথাও আঁতি-পাঁতি খুঁজেও পাওয়া গেলো না, সেটি হল মৌলিক অধিকার। সাংবিধানিক মূল্যবোধ থাকবে অথচ মৌলিক অধিকারের প্রয়োজন থাকবে না, এ কেমন কথা? আবার, মৌলিক কর্তব্য পালন করতে শেখানো জরুরি কিন্তু মানবাধিকার নিয়ে কোনো ন্যূনতম বোধ থাকবে না, এই বা কেমন কথা? ভবিষ্যতের নাগরিক ভালো হবে, সফল হবে, সরকারি আদেশ মৌলিক কর্তব্য হিসেবে মেনে নেবে, আবার নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রতিভায় বাধা অতিক্রম করে যাবে, সর্বোপরি উৎপাদনশীল হবে। কিন্তু সে অধিকার দাবি করবে না, মানবাধিকার নিয়ে সরকারের ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দেবে না (কারণ সেটা সে জানবেই না), অর্থাৎ প্রশ্নহীন আনুগত্য দেবে। এরপরেও কি 'তোতাকাহিনী' মনে পড়বে না? এর পরেও কি একবার নীচের উদ্ধৃতিটির গুরুত্ব আমরা ভুলেই থাকব?

> পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুর-মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।
>
> কোতোয়াল বলিল, 'এ কী বেয়াদবি।'
>
> তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।
>
> রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'
>
> তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।
>
> কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

এতকাল এই কাহিনী পড়ে তির্যক হাসি ই এসেছে। মনে ভেবেছি, 'দেখছ, একে বলে রূপকের চাবুক!' নয়া শিক্ষা নীতির নির্ভার ৬৬ পৃষ্ঠা কটি পড়ার পর এই প্রথমবার 'তোতাকাহিনী' পড়তে গিয়ে কান্না এল। স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলাম রোগা ঠোঁটে, শীর্ণ ডানায় খাঁচা ভাঙার বিফল চেষ্টা আর কোতোওয়ালের শিরোপা পাবার ঘটনাটি। এ রূপক কোথায়? এক হাতে কলম আর এক হাতে সড়কি নিয়ে শিক্ষার হদ্দমুদ্দ যা হয়ে চলেছে সে তো আর কাহিনির রূপক নেই।

কিন্তু পাখির এ দশা হল কেন? লেখক শুরুতেই জানিয়েছেন, হতভাগ্য পাখিটা ছিল মূর্খ, সে কায়দাকানুন জানত না মোটেই কিন্তু বনের ফল খেয়ে রাজ্যের ফলের বাজারে লোকসান ঘটাত। অতএব সহৃদয় রাজা তার শিক্ষার ব্যাবস্থা করলেন। বাজারে লোকসান ঘটালে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে খাঁচায় পুরে রাখতে হয়, এই সারসত্য কথাটি ভুলে যাবার জো নেই। প্রথমে তো তাকে সোনার খাঁচাতেই রাখা হয়েছিল, এবং খাঁচার সৌন্দর্যের খ্যাতি এমন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছিল যে তার নজরদারের উপর নজরদার রাখতে হল, এবং তারা মাস মাস মুঠো মুঠো তন্‌খা পেয়ে সিন্দুক বোঝাই করে ফেললে। নজরদারের তন্‌খা বাজারে মোটে লোকসান ঘটায় না, ঘটায় পাখির খাওয়া বনের ফল।

আমাদের নয়া শিক্ষা নীতিতে ১৬ নম্বর পাতায় দুটি পরিচ্ছেদ জুড়ে বলা আছে 'ভারতীয়' মূল্যবোধ শিক্ষার কথা, বিশেষত প্রাচীন ভারতের অবদান আমাদের আজকের এই উপনিবেশোত্তর ভারতে। স্কুলের পাঠ্যসূচিতে ভারতীয় 'fun fables' যথা পঞ্চতন্ত্র, জাতকের কাহিনি, হিতোপদেশ ইত্যাদি পড়িয়ে শিশুকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মনে এমন ভাব গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা বড়ো হয়ে তাদের নৈতিক জীবনে এর সার্থক প্রয়োগ করতে পারে। জীবনে নৈতিকতার প্রয়োগ নিয়ে নীতি নির্ধারকেরা আবার একটি তালিকা দিয়েছেন। তার মধ্যে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে সেবা, অহিংসা, স্বচ্ছতা, সত্য, নিষ্কাম কর্ম, শান্তি তো ছোটোরা শিখবেই, সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গসমতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, এমনকি 'liberty, equality, fraternity' ও শিখে ফেলবে। শিশুর দল একটি ভারিক্কি

বৃদ্ধসমাজ যেমনটি আশা করে ঠিক তেমনটি হবার শিক্ষা পেয়ে শুরু থেকেই শিক্ষার ভারে ন্যুব্জ হয়ে থাকবে। তারা অনুভূতিশীল হবে না, তারা সাহিত্য পড়বে না, তারা পরখ করে নেবে না, তারা প্রতিবাদ করবে না, তারা তর্ক করবে না — তারা কেবল অনুগত কাজের মানুষ হবে।

এই শিশুর দল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনানীদের সম্বন্ধে জানবে না, তাঁদের মধ্যে কতরকম মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা কত ভাবে স্বাধীনতাকে কল্পনা করেছেন তার হদিশটুকুও পাবে না। তারা জানবে না মানুষের সার্বিক মুক্তির কল্পনায় কত মানুষ কতরকমভাবে কাজ করেছেন, গান বেঁধেছেন, ছবি এঁকেছেন, গল্প, উপন্যাস, কবিতা লিখেছেন। তারা হিতোপদেশ পড়বে মজার ছলে নৈতিক শিক্ষার কারণে, কারণ নীতিশিক্ষাটাই মুখ্য, মজা পাওয়াটা এতটাই গৌণ যে ভুলক্রমেও তারা যেন ভেবে না বসে 'আমাদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ, জানিস নে কি ভাই! একথা কেন বলছি, তা 'Early Childhood Care and Education' সম্পর্কে নীতিগুলি পড়লেই বোঝা যাবে। ECEE বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে ১.৩ পরিচ্ছেদ থেকে ১.৯ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। এইখানে বলা আছে শিশুরা শিখতে শুরু করবে নানা রকম মজার মজার খেলা, গল্প, ছবি ইত্যাদি দিয়ে — কিন্তু এগুলো কোনোটাই কেবলমাত্র শিশুমনকে আনন্দ দেবার জন্য করা হবে না। এগুলো তারা শিখবে কারণ নীতি নির্ধারকেরা চান তাদের মধ্যে 'social capacities, sensitivity, good behaviour, courtesy, ethics, personal and public cleanliness, teamwork, and cooperation' গড়ে উঠুক। শিক্ষার সোনার খাঁচার মধ্যে এতটুকু ফাঁক নেই যেখান থেকে একটুও অনাবশ্যক আনন্দ ঢুকে পড়ে, বা কাজে লাগার বাইরের কিছু কেউ ভেবে বসে বা শিখে ফেলে। শিশুর সুকুমার — বৃত্তির প্রকাশও যেন হয় নিক্তি মেপে। তারা যেন কোনোমতেই বাজারে লোকসান ঘটানোর মতো কিছু না শিখে ফেলে এইটা নীতি নির্ধারকেরা খুব জোর দিয়ে চেয়েছেন, কারণ খেলতে খেলতে যদি ভাঙাচোরা সব কিছু পুড়িয়ে তারা ছাই করে ফেলে তাহলে লোকসান কেবল বাজারের ঘটবে না, বাজার নিয়ন্ত্রকদের নিয়েও হয়তো টানাটানি পড়ে যাবে।

এইখানেই এ প্রসঙ্গে চুপ করে যাওয়া ভালো। তোতাকাহিনীর নিন্দুকের ভাগ্যে ছিল কানমলা-সর্দারের অবাধ দাক্ষিণ্য। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, রাজা এবার কানমলা-সর্দারের সঙ্গে পিঠে-মারা সর্দারকেও ডেকে পাঠাচ্ছেন।

চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ

নয়া শিক্ষা নীতির ১.৮ পরিচ্ছেদে আছে 'Early Childhood Care and Education' অনুসারে ভারতের আদিবাসী-প্রধান এলাকাগুলিতে আশ্রমশালা গড়ে তোলার কথা। এই আশ্রমশালার কথাটা পড়েই আমার সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পটার কথা মনে পড়ে গেল। আমার ওই মুশকিল। নিশ্ছিদ্র কাজের মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা মোটেই পাইনি। দোষটা সম্পূর্ণ আমার নয়। ঐ 'তোতাকাহিনী'র লেখক মহাশয়ের বেশ কিছুটা অবদান ছিল তাতে। তাঁর তৈরি আশ্রমটা যখন খোলা মাঠের খেলা আর নীলগগনের সোহাগ মাখা সকাল সন্ধ্যাবেলার স্থান ছিল, তখন সেখানে দশ দশটি বছর কাটিয়েছিলাম। ঐ খেলতে খেলতে পড়া আর পড়া-পড়া খেলার মধ্যে। মূর্খ, হতভাগ্য পাখিটার মতো অকারণে লাফানো, চ্যাঁচানোটা ছেলেবেলার (নাকি মেয়েবেলার) অভ্যাস আর নিন্দুকের মত ঝোপের আড়ালে থেকে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে বেমক্কা প্রশ্ন করার শিক্ষাই পেয়েছি।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই গল্পটা কেন মনে পড়ল তা একটু প্রথমে বলি। গল্পটা ছোটনাগপুরের আদিবাসী-প্রধান অঞ্চলের একটি মিশনারি ইশকুল নিয়ে। আমি সাহিত্য সমালোচক নই। এর গল্পটির সাহিত্যগুণ আস্বাদ করার ক্ষমতা আছে কেবল, সেই সাহিত্যগুণ ভাষায় বর্ণনা করে অন্যদেরও তার আস্বাদ দেবার ক্ষমতা নেই। তাই আমি কেবল গল্পের কাহিনির অংশটুকুই বলি। ইশকুলের মাস্টারমশাইরা সকলেই হয় বর্ণ হিন্দু নয়তো খ্রিস্টান সাহেব। পড়ুয়ারা অবশ্য মিশ্র — তাদের মধ্যে ওই অঞ্চলের আদিবাসী আছে, বর্ণ হিন্দুও আছে; তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানও বিভিন্ন। আঞ্চলিক 'রাজা' অর্থাৎ জমিদারপুত্ররা যেমন আছে, ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ির বাঙালি ও বিহারি ছেলেরা আছে আর আছে অঞ্চলের ভূমিপুত্র দরিদ্র আদিবাসী ঘরের ছেলেরা। গল্পটা লেখা একজন নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি বর্ণহিন্দু ছাত্রের অবস্থান থেকে। এই লেখক বা কথক তার বহু প্রজন্ম সঞ্চিত বর্ণবাদী ভাবধারার অনুসারে আদিবাসী ছেলেদের অপমান ও বঞ্চনা করতেই অভ্যস্ত, ঠিক যেমনটি করে থাকেন তাদের মাস্টারমশাইরাও। গল্পের নায়ক স্টিফান হোরো এই অপমান আর বঞ্চনার মধ্যে একটি ঝড়ের মতো এসে আবির্ভূত হয় — তার লেখাপড়ার দক্ষতা, খেলার মাঠের বলিষ্ঠতা, চোখা চোখা

কথা বার্তা এবং বর্ণবিদ্বেষকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানোর মানসিক দৃঢ়তা যেন সারা ইশকুলের বর্ণবাদী কাঠামোটাকেই নাড়া দিয়ে দেয়। স্টিফান হোরো, সুবোধ ঘোষের ব্যঞ্জনাময় ভাষায়, অল্প কথায় একটি বিপুল বঞ্চনার ইতিহাসের মূল ধরে টান দেয়। লেখক বা কথক তাই হোরোর সমস্ত কৃতিত্বকেই একটি বিদ্রুপাত্মক বজস্তুতিময় ভাষায় ব্যক্ত করতে থাকে।

হোরো সারা গল্পটি জুড়ে একের পর এক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে — প্রথমে সে ইংরেজির সেরা ছাত্র, তারপর জেদ করে সংস্কৃতর সেরা ছাত্র হয়ে ওঠে। আইরিশ মিশনারি ফাদারের চোখের মণি থেকে সে পণ্ডিতমশাইয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠে। এসব কিছুই নিজের অধ্যয়নের ক্ষমতার জোরে হোরো জিতে নেয়, ঠিক যেমন ভাবে সে জুতো ছাড়াই হকির মাঠে অদম্য (কারণ হোরো চাইলেও বাঙালি ছাত্ররা কেউ একবারও তাকে জুতো ধার দেয়নি, একঘণ্টার জন্যেও না)। এরপর হোরোকে পেয়ে বসে নিজের আদিবাসী ঐতিহ্য খুঁজে বার করার পাগলামি। মিশনারি ফাদার রাগ করেন, শাস্তি দেন। হোরো পাত্তা না দিয়ে প্রাচীন পাহাড়ের আদিবাসী দেবস্থলের বৃদ্ধ রক্ষকের শাগরেদি করে বেড়ায়, তার নাতনি চিরকি মুরমুর সঙ্গে আশনাইয়ে মজে। তারপর একদিন যখন বাঙালি ছাত্ররা সবাই অসহযোগ আন্দোলনে শরিক হয়ে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করে, আজন্ম খামখেয়ালি হোরো হুড়মুড় করে স্কুলে ঢুকে পড়ে। হোরোর মন যে ঠিক কোন্ মুক্তির সন্ধানে মাথা কুটে মরছে তা বর্ণ হিন্দু বাঙালি ছাত্রের নাগালের বাইরেই থেকে যেত যদি না কয়েক বছর পর গল্পের লেখক বা কথক তাকে অদ্ভুত ভাবে আবিষ্কার করত।

আমাদের লেখক বা কথক তখন লোপো থানার দারোগা সেদিন কয়েকজন বিরসাইট মুণ্ডা এসেছে থানায় হাজিরা দিতে — সেদিনই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, হাজিরা দিয়ে তারা নিজেদের গ্রামে ফিরে যাবে। বিরসাইত কারা? সুবোধ ঘোষের অনবদ্য লেখনীর সাহায্য নিয়ে বলা যাক —

> বিরসাইটরা অত্যন্ত সন্দেহভাজন জীব। প্রতি বছর হাঙ্গামা বাধায়। পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে। জঙ্গল আইন মানে না, মহাজনদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়, চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে চায় না। বাজারে বসলে তোলা দেবে না। জমি ক্রোক করতে গেলে আদালতের পেয়াদাকে টাঙি নিয়ে কাটতে আসে। দুবছর আগে একবার স্বরাজ ঘোষণা করেছিল বিরসাইট মুন্ডারা, পাদরিকে মেরেছে, পুলিশকে মেরেছে, অনেকগুলি পুল ভেঙেছে। ওরমান্‌ঝির জঙ্গলে একটা খন্ড যুদ্ধ হয়েছিল ওদের সঙ্গে।

অর্থাৎ কিনা বোঝাই যাচ্ছে, এরা মোটেও অহিংস অসহযোগে বিশ্বাস করে না। সাদা এবং কালো সাহেব নির্বিশেষে শত্রুতা করে। জল-জঙ্গল-জমির অধিকার নিজেদের ইতিহাস অনুসারে বুঝে নেয়, আর তা না করতে দিলে খণ্ডযুদ্ধ করে। তেমনই একজন রুনরু হোরো। দারোগা যখন রুনরু হোরোর দিকে চোখ তুলে তাকায় তখন যে চেহারাটি বর্ণিত হয়, তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্ববিদদের বর্ণনার আশ্চর্য মিল। চেহারাটি কেমন?

> তার মাথার চুলে জংলি খোঁপাটাও জটার চূড়ার মতো হয়ে গেছে। গলায় একটা ভেলাফলের মালা, আদুড় গা, কোমরে ছোটো একটা কাপড় জড়ানো। হাতে একটা কাসাঁর বালা। এই প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে শুধু একজোড়া সুশাণিত আধুনিক চোখ।

ঐ সুশাণিত আধুনিক চোখ লোপো থানার দারোগাকে চিনিয়ে দেয় তার স্কুলের সহপাঠী কে। রুনরু হোরোই হল স্টিফান হোরো! কিন্তু রুনরু হোরো জানায় ওইটাই তার নাম। জানায় তাদের বিরসা ভগবান ইংরেজের কয়েদখানায় অত্যাচারে বেঘোরে মারা গিয়েছেন কিন্তু তাঁর সাবধানবাণী স্মরণে রেখে বিরসাইটরা আজও লড়ে যাচ্ছে আদিবাসী অধিকারের জন্য, জঙ্গলে ঢোকার পাপ নিরসনের জন্য। রুনরু হোরো নিজে এই লড়াই এ নিজের স্বাস্থ্য হারিয়েছে, যক্ষ্মা ব্যাধি বুকে ধরেছে, এমনকি তার প্রেমও হারিয়েছে। চিরকি মুরমু ফাদার লিনডনের হাজারিবাগের মিশনে চলে গিয়েছে খ্রিস্টান হয়ে। রুনরু হোরোর বিরসা ভগবানকে দেখতে যীশু খ্রিস্টের মতো — ঠিক তেমন ভাবেই তো তিনিও নিজেকে আহুতি দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতেই হবে খ্রিস্টের নামে যে শাসনব্যবস্থা চলে বিরসা নিজে বা তাঁর অনুগামীরা তাকে সমর্থন করে না। গল্পের শেষে হোরো ফিরে যায়, একা, পরাজিত। কথকের মনে হয় যেন চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধটয় কেমন করে যেন আমরা সকলে মিলে হোরোকে হারিয়ে দিলাম।

ভারতবর্ষের নবম দশম শ্রেণির ইতিহাসে তিনটি পানিপথের যুদ্ধ পাঠ্য (১৫২৬; ১৫৫৬; ১৭৬১)। এই যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মনে রাখার বিষয় বোধহয় যুযুধান দুই শক্তির আশেপাশে থাকা অন্যান্য শক্তিগুলির নিষ্ক্রিয়,

নিঃস্পৃহ, নিরপেক্ষতা। হাত না বাড়িয়ে দেওয়া। হোরো চেষ্টা করেছিল প্রথমে একা, পরে বিরসাইট সংগঠনের মধ্য দিয়ে লড়াই দেবার। এই বাজারি সভ্যতার আদিপর্বের লড়াই ছিল সেটা। মাঝে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে একটা হাত বাড়িয়ে দেবার প্রয়াস করা হয়েছিল। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটা সামান্য ব্যবস্থা সংরক্ষণের মাধ্যমে চেহারা পাচ্ছিল। কিন্তু সনাতনী বর্ণ ব্যবস্থা, আর তার সঙ্গী গত দুশো বছরে সংগঠিত হয়ে ওঠা মেধার ধারণার দৌরাত্ম্য সহজে জমি ছেড়ে দেবে না। তাই চেপে বসছে নতুন করে সংরক্ষণবিরোধী জঙ্গি মনোভাব। ঠিক যেমন সুযোগসন্ধানী ছদ্ম দেশপ্রেম অবিমিশ্র সামরিকীকরণের ধ্বজা তুলে ধরে, তেমনি করে মেধার একমাত্রিক অর্থের ধ্বজাধারীরা সংরক্ষণের বিরোধিতা করে বর্ণবিদ্বেষকে লালন করে চলে। এমতাবস্থায় যদি মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়, গণতন্ত্রে কল্যাণময় রাষ্ট্রের ভূমিকা বা গণআন্দোলনের *পরিসরকে বাদ দিয়ে একটি নয়া শিক্ষানীতি আসে, তাহলে* সমূহ বিপদের সম্ভবনা। যদিও আসে অবশ্য আর বলি কী করে, এসেই তো পড়েছে। কিন্তু আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জানবার, তর্ক তোলবার এবং ভয়ংকর বঞ্চনার ইতিহাসকে মননশীলভাবে পাঠ করার সুযোগ করে দিতেই হবে। এবার আর রুনরু হোরোকে হারতে দেওয়া যাবে না।

তথ্যসূত্র :

১। https//www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

২। https//indianexpress.com/article/opinion/diversity-and-nuance-digital-education-6509451/

৩। https//indianexpress.com/article/opinion/columns/ucation-policy-reservation-6531546/

৪। https//frontline.thehindu.com/cover-story/high-on-rhetoric/article32306660.ece

৫। https//www.tagoreweb.in/Stories/lipika-147/totakahini-672/1

৬। https//frontline.thehindu.com/cover-story/timeline-worries/article32305885.ece

৭। *সুবোধ ঘোষ, সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা, প্রকাশভবন, ১৩৫৬, ২২২- ২৩৪